আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৎকালীন আরবের ভৌগলিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা (العَرَبُ، الأَرْضُ وَالشَّعْبُ، الحُكْمُ وَالِاقْتِصَادُ، الدِّيَانَةُ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

আরবে ধর্মকর্ম এবং ধর্মীয় মতবাদ প্রসঙ্গে (دِيَانَاتُ الْعَرَبِ):

আরবে বসবাসকারী সাধারণ লোকজন ইসমাঈল (আঃ)-এর দাওয়াত ও প্রচারের ফলে ইবরাহীম (আঃ) প্রচারিত দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। এ কারণেই তাঁরা ছিলেন আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করতেন। কিন্তু কাল প্রবাহে ক্রমান্বয়ে তাঁরা আল্লাহর একত্ববাদ এবং খালেস দ্বীনী শিক্ষার কোন কোন অংশ ভুলে যেতে থাকেন, কিংবা সে সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও আল্লাহর একত্ববাদ এবং দ্বীনে ইবরাহীম (আঃ)-এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থেকে যায় যে পর্যন্ত বনু খুযা'আহ গোত্রের সর্দার 'আমর বিন লুহাই জন সমক্ষে এসে উপস্থিত না হন। ধর্মীয় মতাদর্শের লালন ও পরিপোষণ, দান খয়রাত এবং ধর্মীয় বিষয়াদির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কারণে লোকজন তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপোষণ করতে থাকেন। অধিকন্তু, তাঁকে বড় বড় আলেম এবং সম্মানিত অলীদের দলভুক্ত ধরে নিয়ে তাঁর অনুসরণ করতে থাকেন।

এমন অবস্থার এক পর্যায়ে তিনি শাম দেশ ভ্রমণে যান এবং সেখানে গিয়ে মূর্তি পূজা-অর্চনার জাঁকালো চর্চা প্রত্যক্ষ করেন। শাম দেশ বহু পয়গম্বরের জন্মভূমি এবং আল্লাহর বাণী নাযিলের ক্ষেত্র হওয়ায় ঐ সকল মূর্তি পূজাকে তিনি অধিকতর ভাল এবং সত্য বলে ধারণা করেন। তাই দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি 'হুবল' নামক মূর্তি সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং খানায়ে ক্বাবা'হর মধ্যে তা রেখে দিয়ে পূজো অর্চনা শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে মক্কাবাসীগণকেও পূজা করার জন্য আহবান জানান। মক্কাবাসীগণ তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে মূর্তি হোবলের পূজা করতে থাকেন। কাল-বিলম্ব না করে হিজাযবাসীগণও মক্কাবাসীগণের পদাংক অনুসরণ করতে থাকেন। কারণ, তাঁরাও এক কালে বায়তুল্লাহর অভিভাবক এবং হারামের বাসিন্দা ছিলেন।[1] এভাবে একত্ববাদী আরববাসী অবলীলাক্রমে মূর্তিপূজার মতো এক অতি জঘণ্য এবং ঘৃণিত পাপাচার ও দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এভাবে আরব ভূমিতে মূর্তিপূজার গোড়াপত্তন হয়ে যায়।

হুবাল ছিল মানুষের আকৃতিতে তৈরী লাল আকীক পাথর নির্মিত মূর্তি। তার ডান হাত ভাঙ্গা ছিল। কুরাইশগণ হুবালকে এ অবস্থাতেই প্রাপ্ত হয় এবং পরে তারা উক্ত হাতকে স্বর্ণ দিয়ে মেরামত করে। এটাই ছিল মুশরিকদের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় ও সম্মানিত মূর্তি।

'হুবাল' ছাড়া আরবের প্রাচীনতম মূর্তিগুলোর মধ্যে ছিল 'মানাত' মূর্তি। এটি ছিল বনু হুযাইল ও বনু খুযা'আহর উপাস্য। লোহিত সাগরের তীরে কুদাইদ নামক ভূখন্ডের সন্নিকটস্থ মুসাল্লাল নামক স্থানে তা প্রতিষ্ঠিত ছিল।[2] মুশাল্লাল হল পাহাড় থেকে নেম আসা একটি সরু পথ যা কুদাইদের দিকে চলে গেছে। অতঃপর 'লাত' মূর্তিকে ত্বায়িফবাসী উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে। এটি ছিল বনু সাক্বীফ গোত্রের উপাস্য এবং তা তাফিয়ের মসজিদের বামপাশে মিনারের নিকট স্থাপিত ছিল। এরপর 'যাতে ইরক' এর উচ্চভূমি শামের নাখলাহ নামক উপত্যকায় 'উযযা' নামক মূর্তির পূজা চলতে থাকে। এ মূর্তি ছিল কুরাইশ, বনু কিনানাহসহ অন্যান্য অনেক গোত্রের উপাস্য।

এ তিনটি ছিল আরবের সব চাইতে বড় এবং বিখ্যাত মূর্তি। এর পর হিজাযের বিভিন্ন অংশে শিরক ও মূর্তি পূজার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটতে থাকে।

কথিত আছে যে এক জিন ‘আমর বিন লুহাই এর অনুগত ছিল। সে বলল যে, নূহ সম্প্রদায়ের মূর্তি ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক্ব এবং নাসর জিদ্দার ভূমিতে প্রোথিত রয়েছে। এ মূর্তির খোঁজ পেয়ে আমর বিন লুহাই জিদ্দায় যান এবং মাটি খনন করে মূর্তিগুলোকে বাহির করেন। তারপর সেগুলোকে তুহামায় নিয়ে যান এবং পরবর্তী হজ্জ মৌসুমে মূর্তিগুলো বিভিন্ন গোত্রের হাতে তুলে দেন। এভাবে একেকটি মূর্তি গোত্রগুলোর অধিকারে এসে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন গোত্রের জন্য নির্ধারিত মূর্তিসমূহের বর্ণনা নিম্নরুপ :

ওয়াদ্দ : এ মূর্তি হলো ‘বনু কালব’ এর আরাধ্য মূর্তি। যারা ইরাকের নিকটবতী শামের অন্তর্গত দাওমাতুল জান্দালের জারাশ নামক স্থানের বাসিন্দা।

সুওয়া’ : এ মূর্তি হলো হিযাজের রুহাত্ব নামক স্থানের বনু হুযাইল বিন মুদরিকাহ’র। এ স্থান মক্কার নিকটবর্তী সাহিলের দিকে অবস্থিত।

ইয়াগুস : সাবার নিকটস্থ যুরফ নামক স্থানের বনু গুত্বাইফের মুরাদ গোত্রের উপাস্য।

ইয়াউক্ব : ইয়ামানের খাইওয়ান বস্তির বনু হামদানের মূর্তি। খাইওয়ান হলো হামদানের শাখাগোত্র।

নাসর : হিমইয়ার নামক স্থানের হিমইয়ারীদের অন্তর্গত আলে যুল কিলা’র উপাস্য।

তারা এসকল মূর্তির উপর ঘর নির্মাণ করে এগুলোকে কাবাহর মতো সম্মান করতো ও তাতে গিলাফ দিয়ে ঢেকে দিত। কাবাহতে হাদী বা কুরবানির পশু প্রেরণের মতো ঐসব তাগুতের সম্মানার্থে তারা সেখানেও হাদী প্রেরণ করতো এগুলোর উপর কা’বাহর শ্রেষ্ঠত্ব জানা সত্ত্বেও।

আর এ সকল পথে যেসব গোত্র যাতায়াত করতো তারাও এগুলোর ন্যায় মূর্তি বানিয়ে অনুরূপ গৃহ নির্মাণ করে। এগুলোর মধ্যে যুল খালাসাহ হলো দাওস, খাস'আম ও বুজাইলাহ গোত্রের মূর্তি। তারা ছিল মক্কা ও ইয়ামান এর মধ্যবতী তাবালাহ স্থানের অধিবাসী। ফিলস হলো বনু তাই এবং তাই এর দু’টি পাহাড়- সালামাহ ও আযা'র নিকটে বসবাসকারী লোকেদের মূর্তি। এরকমই একটি হলো রিয়াম। যা ইয়ামান ও হিমইয়ার বাসীর জন্য সন’আয় নির্মিত একটি উপাসনা ঘর। রাযা- বনু রাবী’আহ বিন কা’ব বিন সা’দ বিন যায়দ ও মানাত বিন তামীম এর উপাসনা ঘর। কায়াবাত ওয়ায়িলের দু’পুত্র বাকর ও সানদাদের তাগলিব গোত্রের।

দাওসের যুল কাফফাইন নামক আরেকটি মূর্তি ছিল। বনু বাকর, বনু মালিক, বনু মালকান- যারা কেনানাহর বংশধর তাদের সা’দ নামক আরেকটি মূর্তি ছিল। উযরাহ গোত্রের একটি মূর্তি ছিল যাকে বলা হতো শামস এবং বনু খাওলানের গুমইয়ানিস নামক একটি মূর্তি ছিল।

এভাবে মূর্তি ছড়িয়ে পড়তে পড়তে একসময় সমগ্র আরব উপদ্বীপ মূর্তিতে ছেয়ে যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক গোত্র ও ঘরে ঘরে তা স্থান করে নেয়। তারপর মক্কার মুশরিকগণ একের পর এক মূর্তি দিয়ে মসজিদুল হারামকেও পরিপূর্ণ করে তোলেন। কথিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মসজিদুল হারামে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করেছিলেন। একের পর এক তিনি যখন মূর্তিগুলোকে লাঠি দিয়ে আঘাত করছিলেন তখন সেগুলো পড়ে যাচ্ছিল। তারপর তিনি সেগুলোকে মসজিদুল হারামের বাইরে নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়[3]। অধিকন্তু

কা’বাহর অভ্যন্তরভাগে কিছু মূর্তি ও ছবি ছিল। তার মধ্যে একটি হলো ইবরাহীম (আঃ) ও অপরটি হলো ইসমাঈল (আঃ) আকৃতিতে তৈরি। এ উভয় মূর্তির হাতে ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন এসব মূর্তিকে নিশ্চিন্ন করে দেয়া হয় এবং ছবিগুলোকে মুছে দেয়া হয়।

এসব মূর্তির ব্যাপাবে মানুষ গভীর তমসাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্তিতে ছিল। এমনকি আবূ রাযা উতারিদী (রা.) বলেন, ‘আমরা পাথরের পূজা করতাম। অতঃপর যখন এর চেয়ে ভাল মানের পাথরের সন্ধান পেতাম তখন আগেরটির পূজা পরিত্যাগ করে এবং নতুন পাথরটির পূজা আরম্ভ করে দিতাম। আবার পূজা করার মতো কোন পাথর না পেলে কিছু মাটি স্তূপাকারে একত্রিত করতাম। তারপর দুগ্ধবতী ছাগল নিয়ে ঐ স্তূপের উপর দোহন করে তা ত্বাওয়াফ করতাম।

মোট কথা মূর্তিপূজা ও অংশীবাদিতা দ্বীনের ক্ষেত্রে সব চেয়ে নিকৃষ্ট অনাচার এবং পাপাচার হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন আরববাসীগণের অসার অহংকার ও ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তারা দ্বীনে ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

এ জঘণ্য শিরক ও মূর্তিপূজা চালু হওয়া এবং লোকেদের মাঝে বিস্তার লাভের কিছু প্রেক্ষাপট রয়েছে তা হলো : যখন তারা ফেরেশতা, নাবী-রাসূল ও ওলী-আওলীয়া, পরহেযগার-দ্বীরদার এবং ভালকাজে প্রতিষ্ঠিত সৎকর্মশীল লোকদেকে প্রত্যক্ষ করল এবং এও প্রত্যক্ষ করল যে, তারা হলেন আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি, সম্মান-মর্যাদায় আল্লাহর প্রিয়পাত্র এতদসত্ত্বেও যখন তাদের হাতে বিশেষ কোন কারামাত প্রকাশ পেল এবং এমন অসম্ভব কাজ সম্পন্ন হলো যা সাধারণত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় তখন তারা মনে করল যে, আল্লাহ তাআলা ঐ সকল লোকের হাতে তার কিছু ক্ষমতা, কুদরত ও নিজেদের ইচ্ছেমত কিছু করার শক্তি দান করার মাধ্যমে তাদেরকে বিশেষত্ব দান করেছেন। আর তাদের এ ক্ষমতা ও মর্যাদার কারণে তারা আল্লাহ তাআলা ও সাধারণ মানুষের মাঝে মধ্যস্ত তা ও করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। সুতরাং এ সকল ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যম ব্যতীত কারও পক্ষে আল্লাহর দরবারে সরাসরি নিজেদের প্রয়োজন বা আবেদন-নিবেদন পেশ করা সম্ভব নয় এবং তাদের মর্যাদার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের সুপারিশকে ফিরত দেন না। ঠিক অনুরূপভাবে ঐ সব ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যম ব্যতিত আল্লাহর কোন ইবাদতও প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কেননা তারা বিশেষ মর্যাদার বলে তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়ে দেবে।

তাদের মাঝে এ ধারণা যখন বদ্ধমূল হলো ও তাদের মনে তা স্থায়ী আসন লাভ করল তখন ঐ সব ব্যক্তি বা বস্তুকে তাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ ও নিজেদের মাঝে মধ্যস্ততাকারী সাব্যস্ত করল এবং প্রভুর নিকট নৈকট্যলাভের যাবতীয় বিষয়কে তাদের দায়িত্বে ছেড়ে দিল। অতঃপর তাদের সম্মানার্থে তাদের ছবি, ভাষ্কর্য ও প্রতিমা তৈরি করল। এসকল ছবি ও প্রতিমা কখনোও তাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হুবহু আকৃতিতে তৈরি করতো। আবার কখনো তাদের খেয়াল-খুশিমতো আকৃতি দিয়ে তৈরি করতো। অতঃপর এসব ছবি ও প্রতিমাকেই তারা উপসনার যোগ্য মূর্তি বলে নামকরণ করতো।

কখনো তারা এসবের ছবি বা প্রতিমা তৈরি করতো না বটে তবে তাদের কবর বা সমাধিস্থল, বাসস্থান, অবতরণস্থল বা বিশ্রামস্থলকে পবিত্রতম স্থান হিসেবে দিয়ে সেগুলোর উদ্দেশ্যে মানত ও নযর নিয়ায ইত্যাদি উৎসর্গ করতো। আর সেখানে তারা খুব বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ করতো এবং তাদের ঐসব স্থানকে তারা মূর্তির নামে নামকরণ করতো। এ দিকে আবার জাহেলিয়া যুগের লোকজনদের মূর্তি পূজার বিশেষ বিশেষ রীতি পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। এসবের অধিকাংশই ‘আমর বিন লোহায়েরই মন গড় তৈরি। ইবনে লুহাই প্রবর্তিত মূর্তিপূজকের

দল মনে করত যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে তিনি যে রীতিপদ্ধতির কথা বলেছেন তা ইবরাহীম (আঃ) প্রবর্তিত দ্বীন এর পরিবর্তন কিংবা বিলোপসাধন নয়। বরং সেটা হচ্ছে ভালোর জন্য কিছু কিছু নবতর সংযোজনের মাধ্যমে সর্বযুগের সকল মানুষের উপযোগী একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান প্রবর্তন। জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা তাদের মন গড়া দ্বীনের ক্ষেত্রে যে রীতি পদ্ধতির প্রচলন করে নিয়েছিলেন তা হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপ :

১. মূর্তিপূজকগণ দরগার খাদেমের মতো মূর্তির পাশে বসে তাদের নিকট আশ্রয় অনুসন্ধান করতেন, উচ্চকণ্ঠে তাদের আহবান জানাতেন, অভাব মোচন ও বিপদাপদ হতে উদ্ধারের জন্য অনুনয় বিনয় সহকারে তাদের নিকট প্রার্থনা জানাতেন। প্রার্থনাকারীগণ মনে করতেন যে, মূর্তিরূপী এ সকল দেবদেবী তাঁদের প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহর নিকটে সুপারিশ পেশ করবে যা তাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

২. তাঁরা মূর্তির উদ্দেশ্যে হজ্জ সম্পন্ন করতেন, মূর্তিকে তাওয়াফ এবং সিজদাহহ করতেন এবং তাদের সামনে অত্যন্ত ভক্তি ও বিনয়াবনত আচরণ করতেন।

৩. মূর্তিদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের মানত এবং কুরবাণী উৎসর্গ করা হতো। উৎসর্গীকৃত জীবজানোয়ারগুলোকে মূর্তির বেদীমূলে তার নাম নিয়ে জবেহ করা হতো। ঘটনাক্রমে অন্য কোথাও জবেহ করা হলেও মূর্তির নাম নিয়েই তা করা হতো। তাঁদের এ উসর্গীকৃত পশু জবেহ করা প্রসঙ্গে দুটি রীতির কথা আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মাজীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন:

(وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) [المائدة: 3]

“ আর যা কোন আস্তানায় (বা বেদীতে) যবহ করা হয়েছে।” (মায়িদা ৫ : ৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

(وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام:121]:

“যাতে (যবহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা মোটেই খাবে না।” (আল আন‘আম ৬ : ১২১)

৪. মূর্তি পূজকগণ পূজার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের কিছু অংশ, উৎপাদিত শস্যাদি এবং পালিত পশুদলের কিছু অংশ মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করে রাখত। এ ক্ষেত্রে আরও একটি আকর্ষণীয় ও প্রনিধানযোগ্য ব্যাপার ছিল, উৎপাদিত শস্যাদি এবং পালিত পশুদলের কিছু অংশ আল্লাহর নামেও নির্দিষ্ট করে রাখা হতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনটি হতে দেখা যেত যে আল্লাহর নির্দিষ্ট করে রাখা দ্রব্যাদি মূর্তির জন্য রেখে দেয়া দ্রব্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে তা মূর্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দেয়া হতো, কিন্তু মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা দ্রব্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে কখনই তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হতো না। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন:

(وَجَعَلُوْا لِلهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلٰى شُرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُوْنَ) [الأنعام:136]

“ আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তাথেকে তারা আল্লাহর জন্য একটা অংশ নির্দিষ্ট করে আর তারা তাদের ধারণামত বলে এ অংশ আল্লাহর জন্য, আর এ অংশ আমাদের দেবদেবীদের জন্য। যে অংশ তাদের দেবদেবীদের জন্য তা আল্লাহর নিকট পৌঁছে না, কিন্তু যে অংশ আল্লাহর তা তাদের দেবদেবীদের নিকট পৌঁছে। কতই না নিকৃষ্ট এ লোকদের ফায়সালা!” (আল আন‘আম ৬ : ১৩৬)

৫. মূর্তির নৈকট্য লাভের আরও একটি রীতি ছিল যে, মুশরিকগণ শস্যাদি এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির মানত মানতো আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেনঃ

(وَقَالُوْا هٰـذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَنْ نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ) [الأنعام:138].

‘তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এ গবাদি পশু ও ফসল সুরক্ষিত। আমরা যার জন্য ইচ্ছে করব সে ছাড়া কেউ এগুলো খেতে পারবে না। এ সব তাদের কল্পিত। কিছু গবাদি পশুর পিঠে চড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিছু গবাদি পশু যবহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম নেয় না।’ [আল আন‘আম (৬) : ১৩৮]

৬. সে সব চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে ‘বাহীরা, সায়িবাহ, ওয়াসীলা এবং হামী’ নামে পশু ছিল।

সাঈদ বিন মুসায়্যিব বলেন, ‘বাহীরাহ’ হল এমন উল্লী যার স্তনকে মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। সুতরাং কোন মানুষ তার থেকে দুধ দোহন করতো না। ‘সায়িবাহ’ এমন উষ্ট্রী যা দেবদেবীর নামে ছেড়ে দিত। ফলে কেউ তাতে আরোহন করতো না। ‘ওয়াসিলাহ’ বলা হয় এমন উষ্ট্রীকে যার প্রথম গর্ভ থেকে স্ত্রী উট জন্ম নেয়। অতঃপর দ্বিতীয়বারও স্ত্রী উট জন্ম নেয়। মাঝখানে পুরুষ উট না জন্মে এরকম পরপর স্ত্রী উট জন্ম নিলে তারা সে উটকে মূর্তির নামে ছেড়ে দিত। ‘হামী’ বলা হয় এমন পুরুষ উটকে যার বীজ দ্বারা দশটি উষ্ট্রীর গর্ভধারণ হয়েছে। সংখ্যা পুর্ণ হলে ঐ উটকে দেবদেবীর নামে ছেড়ে দিত। ঐ উটের উপর কেউ আরোহন করতো না।

ইবনে ইসহাক্ব বলেন যে, ‘বাহীরা’ সায়্যিবাহরই’ মেয়ে সন্তানকে বলা হয় এবং সেই উটকে ‘সায়িবাহ’ বলা হয় যার গর্ভ থেকে দশ বার কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে, এর মধ্যে কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয় নি। এমন অবস্থা বা প্রকৃতির উটকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো। এর পৃষ্ঠদেশে কেউ আরোহণ করত না, এর লোম কর্তন করত না এবং মেহমান ব্যতীত অন্য কেউই তার দুগ্ধ পান করত না।

এরপর সেই উট যখন মেয়ে সন্তান প্রসব করত তখন তাঁর কান চিরে দেয়া হতো এবং তাকেও তার মায়ের সঙ্গে মুক্তভাবে চলা ফেরার জন্য ছেড়ে দেয়া হতো। এর পৃষ্ঠদেশে কেউ সওয়ার হতো না, তার লোম কাটা হতো না এবং মেহমান ব্যতীত অন্য কেউই তা দুগ্ধও পান করত না। একে বলা হতো ‘বাহীরা’ এবং তার মাকে বলা হতো ‘সায়িবাহ’।

‘ওয়াসীলাহ’ বলা হতো সেই ছাগীকে যে ছাগী একাদিক্রমে দুটি দুটি করে পাঁচ দফায় দশটি কন্যা সন্তান প্রসব করে এবং এর মধ্যে কোন পুত্র সন্তান প্রসব করে না। সেই ছাগীকে এ কারণে ওয়াসীলা বলা হয় যে, সে তার সবগুলো মেয়ে সন্তানকে একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে। এর পর সেই ছাগী যে বাচ্চা প্রসব করবে তাকে শুধু পুরুষ লোকেরাই খেতে পারবে, মহিলারা খেতে পারবে না। তবে যদি তা কোন মৃত বাচ্চা প্রসব করে তবে পুরুষ এবং মহিলা সকলেই তা খেতে পারবে।

সেই উটকে ‘হামী’ বলা হয় যার প্রজননের মাধ্যমে পর পর একাদিক্রমে দশটি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেছে এবং এ সবের মধ্যে কোন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে নি। এ জাতীয় উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশ সংরক্ষিত থাকত, অর্থাৎ এর প্রষ্ঠদেশে আরোহণ নিষিদ্ধ ছিল। এর লোমও কর্তন করা হতো না। শুধুমাত্র প্রজননের উদ্দেশ্যে উটের পালের মধ্যে ওকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো, অন্য কোন কাজে ওকে ব্যবহার করা হতো না। জাহেলিয়াত আমলের মূর্তি পূজার সেই সকল রীতি পদ্ধতির প্রতিবাদ করে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেনঃ

(مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيْلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلٰـكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ) [المائدة:103]

‘আল্লাহ না নির্দিষ্ট করেছেন বাহীরাহ্, না সাইবাহ্, না ওয়াসীলাহ্, না হাম বরং যারা কুফুরী করেছে তারাই আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করে তা আবিষ্কার করেছে, তাঁদের অধিকাংশই নির্বোধ। ’’ (আল-মায়িদাহ ৫ : ১০৩)

(وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰـذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاء) [الأنعام:139]

‘তারা আরো বলে, এ সব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা খাস করে আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, আর আমাদের স্ত্রীলোকদের জন্য নিষিদ্ধ, কিন্তু তা (অর্থাৎ গর্ভস্থিত বাচ্চা) যদি মৃত হয় তবে সকলের তাতে অংশ আছে। তাদের এ মিথ্যে রচনার প্রতিফল অচিরেই তিনি তাদেরকে দেবেন, তিনি বড়ই হিকমাতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।’’ (আল-আন‘আম ৬ : ১৩৯)

যেভাবে উল্লেখিত পশুগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যেমন- বাহীরা, সায়িবাহ ইত্যাদি এবং এ ছাড়া আরও বর্ণনা করা হয়েছে[4] তা ইবনে ইসহাক্বের উল্লেখিত ব্যাখ্যার কিছু বিপরীত এবং কিছুটা অন্য ধরণের বলে মনে হয়। সাঈদ বিন মুসাইব (আঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এ পশুগুলো মুশরিকদের তাগুত মূর্তি সমূহের জন্য ছিল।[5]

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

(رَأَيْتُ عُمَرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَى الْخُزَاعِى يَجُرُّ قَصَبَهُ [أَيْ أَمْعَاءَهُ] فِي النَّارِ)

‘‘আমি আমর বিন লুহাইকে জাহান্নামের মধ্যে তার নাড়ি-ভুড়ি টানতে দেখেছি।’’ কেননা ‘আমর বিন লুহাই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ইবরাহীম (আঃ)-র দ্বীনে পরিবর্তন আনয়ন এবং মূর্তির নামে চতুষ্পদ জন্তু উৎসর্গ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।[6]

আরববাসীগণ মূর্তিকে কেন্দ্র করে এতসব কিছু করত এ বিশ্বাসে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে। যেমনটি কুরআন কারীমে বলা হয়েছে যে,

(مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفٰى) [الزمر: 3]

(মুশরিকগণ বলত) ‘আমরা তাদের ‘ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেবে।’’ (আয-যুমার ৩৯ : ৩)

আরও ইরশাদ হয়েছেঃ

(وَيَعْبُدُوْنَ مِن دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هـَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ) [يونس:18]

‘‘আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে ‘ইবাদাত করে এমন কিছুর যা না পারে তাদের কোন ক্ষতি করতে, আর না পারে কোন উপকার করতে। আর তারা বলে, ‘ওগুলো আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী।’’ (ইউনুস ১০ : ১৮)

আরবের মুশরিকগণ ‘আযলাম’ অর্থাৎ কথন সম্পর্কে ফলাফল নির্ণয়ের জন্য তীরও ব্যবহার করত (আযলাম হচ্ছে যালামুন এর বহু বচন এবং যালাম ঐ তীরকে বলা হয় যার উপর পালক লাগানো হতো না)। ভবিষ্যৎ কথন

সম্পর্কিত ফলাফল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তীরগুলো ছিল তিন প্রকারের:

প্রথম : এ শ্রেণীভুক্ত তীরগুলোর গায়ে (نعم) 'হ্যাঁ'' কিংবা (لا) না অথবা (غفل) 'ব্যর্থ' লেখা থাকত। এ শ্রেণীভুক্ত তীরগুলো সাধারণত ভ্রমণ, বিয়ে-শাদী এবং অনুরূপ অন্য কোন কার্যোপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হতো। বিশেষ একটি পদ্ধতিতে তীর বাছাই পর্ব সম্পাদিত হতো। কর্মপন্থা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বাছাইকৃত তীর গোত্রে 'হ্যাঁ'' লেখা থাকলে পরিকল্পিত কাজ আরম্ভ করা হতো। কিন্তু বাছাই করতে গিয়ে 'না'' লিখিত তীর বাহির হলে পরিকল্পিত কাজটি এক বছরের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হতো এবং আগামীতে আবার এ কাজের জণ্য গুণাগুণ বা লক্ষণ নির্ধারক বাহির করা হতো। আর যদি 'ব্যর্থ' লিখিত তীর বের হতো তবে আবার একইভাবে বাছাই করা হতো যতক্ষণ পর্যন্ত 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখিত তীর বের হতো।

দ্বিতীয় : এ শ্রেণীভুক্ত তীরগুলোর কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'পানি'' কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'দিয়াত'' এবং অন্যান্যগুলোর গায়ে লেখা থাকত অন্য কোন কিছু।

তৃতীয় : এ শ্রেণীভুক্ত তীরগুলোর মধ্যে কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'তোমাদের অন্তর্ভুক্ত'', কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'তোমাদের ছাড়া'', হয়তো বা কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'মুলসাক' (যার অর্থ হচ্ছে মিলিত)। উল্লেখিত তীরগুলোর ব্যবহার ছিল এরূপ- কারো বংশ পরিচয়ের ব্যাপারে যখন সন্দেহের সৃষ্টি হতো তখন তাকে একশত উটসহ হুবাল নামক মূর্তির নিকট নিয়ে যাওয়া হতো। উটগুলো তীরধারী সেবায়েতের (ঋষি) নিকট সমর্পণ করা হতো। তিনি সবগুলো তীর একত্রিত করে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে ঘুরাতে থাকতেন। তারপর তার মধ্য থেকে একটি তীর বাহির করে আনা হতো। তীর গাত্রে 'তোমাদের অন্তর্ভুক্ত' লিখিত তীরটি যদি বাহির হতো তবে তাঁকে তাঁদের গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে স্থান দেয়া হতো। অপরপক্ষে যদি 'তোমাদের বাহিরের' লিখিত তীরটি বাহির হতো তখন তাঁকে 'হালীফ' হিসেবে স্থান দেয়া হতো। কিন্তু যদি 'মুলসাক' লিখিত তীরটি বাহির হতো তাহলে তাঁকে তাঁর নিজস্ব স্থানেই রাখা হতো। সেই গোত্রীয় ব্যক্তি কিংবা 'হালীফ' হিসেবে স্থান দেয়া হতো না।[7]

তারা এ তীর দ্বারা ভাগ্যের ভাল মন্দ যাচাই করতো। মূলত এটা এক প্রকার জুয়া খেলা। এর ধরণ হলো, তারা এ মাধ্যমে উটের মাংসের কার ভাগে পড়বে তা নির্ধারণের জন্য তীর ঘুরাতো। এ উদ্দেশ্যে তারা বাকীতে উট ক্রয় করে তা জবাই করে ২৮ অথবা দশ ভাগে ভাগ করতো। অতঃপর এ ব্যাপারে তীর ঘুরাতো। যার মধ্যে (الرابح) 'রাবিহ' ও (الغفل) 'গুফল' নামের তীর থাকতো। যার ক্ষেত্রে (الرابح) তীর বের হতো সে উটের মাংসের অংশ পেত। আর যার ক্ষেত্রে (الغفل) তীর বের হতো সে ব্যর্থ ও হতাশ হতো এবং ঐ উটের মূল পরিমাণ জরিমানা পরিশোধ করতে হতো।

আরবের মুশরিকগণ তথাকথিত ভবিষ্যদ্বক্তা যাদুকর এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদগণের ভবিষ্যদ্বাণী, কলাকৌশল এবং কথাবার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতেন। যিনি আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী করতেন এবং গোপন তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদি অবগত আছেন বলে দাবী করতেন তাঁকে বলা হতো 'কাহিন'। কোন কোন কাহিন এরূপ দাবীও করতেন যে, একটি জিন তাঁর অনুগত রয়েছে এবং সে তাঁকে সংবাদটি সংগ্রহ ও পরিবেশন করে থাকে। কোন কোন কাহিন আবার এরূপ দাবীও করতেন যে, অদৃশ্যের খবরাখবর নেয়ার মতো যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি তাঁর রয়েছে এবং তিনি তা নিয়েও থাকেন।

তৎকালীন সমাজে আরও এক ধরণের লোক ছিলেন যাঁরা মানুষের কথা ও কর্মের উপর অনুসন্ধান চালিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। এরা 'আররাফ' নামে অভিহিত ছিলেন। তাঁদের দাবী ছিল, কোন লোক যখন

কোন কিছু ব্যাপারে অবগত হওয়ার জন্য তাঁর নিকট আগমন করেন তখন তাঁর অবস্থা, কিছু কিছু পূর্ব লক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কথাবার্তার মাধ্যমে ঘটনার স্থান বা ঠিকানা এবং ঘটনার সঙ্গে সংশিষ্ট ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিগোষ্ঠির খোঁজখবর তিনি দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- অপহৃত সম্পদ, অপহরণের স্থান ও সময়, হারানো পশু কিংবা অন্য কোন কিছু সম্পর্কিত খোঁজ খবর।

জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ : আকাশ মন্ডলে তারকা রাজির গতিবিধি, উদয়াস্ত, আগমন-প্রত্যাগমন ইত্যাদি লক্ষ্য করে ভবিষ্যতের আবহাওয়া কিংবা ঘটতে পারে এমন ঘটনা, কিংবা দুর্ঘটনা সম্পর্কে আভাস ইঙ্গিত প্রদান হচ্ছে জ্যোতিষীগণের কাজ।[৪] জ্যোতিষীগণের চিন্তা-চেতনা এবং গণনার প্রভাব আজও যেমন জন-সমাজে লক্ষ্য করা যায় সেকালেও তেমনটি ছিল। কিন্তু বিশেষ তফাৎ ছিল, তারকারাজির অবস্থা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে বৃষ্টি বাদলের পূর্বাভাষ দেয়া হলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, এ তারকাই তাঁদের বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। তাঁদের মঙ্গলামঙ্গলের মূলে রয়েছে এ তারকারা। এভাবে তাঁরা জঘণ্য শির্ক করে বসতেন।[9]

ত্বিয়ারাহ : আরবের মুশরিকগণ কোন কাজকর্ম আরম্ভ করা পূর্বে কাজের ফল 'ভালো' কিংবা 'মন্দ' হতে পারে তা যাঁচাই করে নেয়ার জন্য কতিপয় মনগড়া রেওয়াজের প্রচলন করে নিয়েছিল। এরূপ যাচাইয়ের এ প্রথাকে বলা হতো ত্বিয়ারাহ। এতে তাঁদের স্বকীয় ধারণা-প্রসূত যে সকল কাজকর্ম করা হতো তা হচ্ছে-

যখন তাঁরা কোন কাজ করার ইচ্ছা করতেন তখন তা আরম্ভ করার পূর্বে কোন পাখিকে উড়িয়ে দেয়া হতো কিংবা হরিণকে তাড়া করা হতো। পাখি কিংবা হরিণ যদি তাঁদের ডান দিক দিয়ে পলায়ন করত তাহলে এটাকে শুভ লক্ষণ মনে করে তাঁরা তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করে দিতেন। কিন্তু বাম দিক দিয়ে পলায়ন করলে সেটাকে অশুভ লক্ষণ মনে করে কাজ করা থেকে বিরত থাকত। অনুরূপভাবে কোন পশু কিংবা পাখিকে যদি রাস্তায় আঁচোড় কাটতে দেখা যেত তাহলে সেটাকে অমঙ্গলের পূর্ব লক্ষণ বলে মনে করা হতো।

অশুভ কোন কিছুর প্রভাব কাটানোর জন্য খরগোশের পায়ের গোড়ালির উপরের হাড় ঝুলিয়ে রাখা হতো। সপ্তাহের কোন কোন দিন অশুভ, কোন কোন মাস অশুভ, কোন কোন চতুষ্পদ জন্তু অশুভ, কোন কোন মহিলার দর্শন অশুভ, দিন-রাত্রির কোন কোন সময় অশুভ, কোন কোন বাড়িঘর অশুভ ইত্যাদি নানা কুসংস্কার তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারীকে কোন অশুভ শক্তির পাঁয়তারা বলে মনে করা হতো। অধিকন্তু, মানাবাত্মা পেঁচায় পাওয়ার ব্যাপারটিও তাঁরা বিশ্বাস করতেন। তাঁদের এ বিশ্বাস ছিল যে কোন লোককে কেউ হত্যা করলে যতক্ষণ তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হয় ততক্ষণ সে আত্মার শান্তি লাভ হয় না। সেই আত্মা পেঁচায় পরিণত হয়ে জনশূন্য প্রান্তরে ঘোরাফিরা করতে থাকে[10] এবং 'পিপাসা পিপাসা' অথবা 'আমাকে পান করাও' 'আমাকে পান করাও' বলে আওয়াজ করতে থাকে। যখন সেই হত্যা প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় তখন সে শান্ত হয়।

ফুটনোট

[1] শাইখ মুহাঃ আব্দুল নাজদী (রহঃ) মুখতাসার সীরাতুর রাসূল (সাঃ) ১২ পৃঃ।

[2] সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ২২২ পৃঃ।

[3] শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী মুখতাসার সীরাতুর রাসূল (সা.) ১৩, ৫০-৫৪ পৃঃ।

[4] সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ৮৯-৯০ পৃঃ।

[5] সহীহুল বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ৪৯৯ পৃঃ।

[6] প্রাগুক্ত

[7] মুহাযারাতে খুযরী ১ম খন্ড ৫৬পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ১০২-১০৩ পৃঃ।

[8] মিরআতুল মাফাতীহ শারাহ মিশকাতুল মাসাবীহ (লক্ষ্ণৌমুদ্রণ ২য় খন্ড ২-৩ পৃঃ।

সহীহুল মুসলিম শরীফ নাবাবী শারাহ সহ ঈমান পর্ব বাবু বয়ানে কুফরি মান কালা মোতেবনা বিন নাওই ১ম খন্ড ৯৫ পৃঃ।

[9] সহীহুল মুসলিম শরীফ নাবাবী শারাহ সহ ঈমান পর্ব বাবু বয়ানে কুফরি মান কালা মোতেবনা বিন নাওই ১ম খন্ড ৯৫ পৃঃ।

[10] সহীহুল বুখারী শরীফ ২য় খন্ড ৮৫১, ৮৫৭ পৃঃ (ব্যাখ্যা সহ)।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6054

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন